রবীন্দ্রনাথের বলাকা: দরকারি আহ্বানের উজ্জ্বল ইশারা

Link - banglanews24.com

রবীন্দ্রনাথের নানান রূপ। এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, ভাবনা-বৈচিত্র্য আর চিন্তা পরিবেশনের ক্রম-পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথকে বৈশ্বিক দার্শনিকের মর্যাদায় আসীন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের নানান রূপ। এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, ভাবনা-বৈচিত্র্য আর চিন্তা পরিবেশনের ক্রম-পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথকে বৈশ্বিক দার্শনিকের মর্যাদায় আসীন করেছে। তাঁর কবিতা-গান-নাটক-কথামালা-চিত্রকলা আর উন্নয়ন-বিষয়ক চিন্তারাজির প্রবল বাতাসে বাঙালির মনে ও ভাবনায় আজ বিপুল উদ্দীপনা বিরাজমান। মানব-জীবনের বহু-বিচিত্র বিষয়াদি তিনি হাজির করেছেন কবিতার ক্যানভাসে। প্রকৃতি, মানব-মন, আনন্দ-বেদনা আর পাওয়া-না-পাওয়ার অনেক হিসেব হয়তো মিলবে বরিঠাকুরের কবিতার কাহিনি-বিন্যাসে, চিন্তাপ্রকাশের গতি-অন্বেষায় ও বিকাশে। মানুষের প্রবণতাগুলিকে আলোড়িত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সার্বক্ষণিক যে আকুলতা, তার সরল-স্বাভাবিক-প্রত্যাশিত ভাবনাগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে তাঁর কবিতা-বুননের কৌশলে আর পরিবেশনশৈলীর অভিনব রূপে ও মহিমায়।

১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দের দিকে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণের ফলে কিছু অপ্রত্যাশিত মানসিক সংকটের মধ্যে নিপতিত হলেন। হতাশা, মৃত্যুচিন্তা, একাকিত্ব- এসব কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হলেন কবি। তাঁর ডাকঘর (প্রকাশকাল: ১৯১১) নাটকে এই অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে দেখি আমরা। অপ্রত্যাশিত এই মৃত্যুলগ্নতা তাঁকে পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে ভিন্নভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। তখন কবি পৃথিবীর অসীম রহস্য, তার অস্থিরতা (স্থিরতা নয় অর্থে) সম্বন্ধে আরো আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এমন সময়, জানা যায়, একদিন তিনি কাশ্মীরের ঝিলম নদীতীরে সন্ধ্যাবেলা বসে বসে কী যেন ভাবছিলেন, তখন এক ঝাঁক বলাকার দ্রুত উড়ে চলার দৃশ্য ও রহস্য তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। বলাকা পর্বের কবিতাগুলি সে ভাবনার শৈল্পিক প্রকাশ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাপ্তির অন্তত তিনবছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্য-পরিক্রমার নতুন বাঁকের অন্য এক ফসল বলাকা (৪৫টি কবিতা নিয়ে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)। গ্রন্থে সংকলিত সকল কবিতাই সাময়িকপত্রে (সবুজপত্র, প্রবাসী, মানসী ও ভারতী) ছাপা হয়েছিল। এ কথা বোধকরি প্রায় সকল সাহিত্যপাঠক অবগত আছেন যে, এই বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিত্ব ক্রমাগত তাঁর চিন্তাপ্রকাশের পথ পরিবর্তন করেছেন। এই বাঁক পরিবর্তনও তাঁর সারাজীবনের সাহিত্যসাধনার এক অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যেরই রূপায়ন মাত্র। বলাকায় কবি তারুণ্যের, শক্তির এবং উদ্দীপনার পক্ষে কথামালা সাজিয়েছেন। নবীন-যুবাদের প্রতি কবির অসীম বিশ্বাস আর আস্থার কথা আমরা জানতে পারি তাঁর এ গ্রন্থের অশেষ অনুপ্রেরণামূলক একটি কবিতার পঙক্তিতে পঙক্তিতে। কবিতাটির প্রথমাংশের পাঠ এরকম:

“ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,

আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

রক্ত আলোয় মদে মাতাল ভোরে

আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,

সকল তর্ক, হেলায় তুচ্ছ ক’রে

পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।

আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।” (সবুজের অভিযান)

কেবল ঘরের মধ্যে, সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে; নতুন বারতা নতুন চিন্তাকে আত্মস্থ না করে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু এও সত্য যে নতুন কোনো কিছুর সূচনা করলে একশ্রেণীর প্রাচীনপন্থি মানুষ তাতে বাধা দেয়। তারা নতুনের অভিযাত্রাকে ভয় পায়; তাই নতুনের আবাহনে ও অবগাহনে তাদের যত আপত্তি। তবে মনে রাখতে হবে, সকল জ্ঞানও কাজের ভুবনে, নব নব চিন্তার উদ্ভব হলে নতুন-পুরাতনের মধ্যে যে পার্থক্য, তা প্রকাশ পায়। সত্য এবং মিথ্যার দ্বন্দ্ব না হলে আমরা কী করে জানবো যে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা? তাই রবিঠাকুরের ভাবনায় প্রাচীনপন্থিদের অহেতুক অহমিকাকে দূর করতে হলে, সত্যের পথ ও পাথেয়কে সঠিকভাবে নির্দেশ করতে হলে তারুণ্যের নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনাকে অভিবাদন জানাতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এই কথাগুলিই ধরা পড়ে এভাবে:

“বাহির-পানে তাকায় না যে কেউ,

দেখে না যে বান ডেকেছে-

জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।

চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে

মাটির ’পরে চরণ ফেলে ফেলে,

আছে অচল আসনখানা মেলে

যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।”(ওই)

কেবল পটে আঁকা ছবি বলে যাকে আমরা চিনি, তার মধ্যেও রবিঠাকুর খুঁজে ফিরেছেন প্রেরণার অমিত শক্তির আভাস। “তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা?” -এই প্রশ্নের অন্তরালে তিনি সাজিয়েছেন আমাদের না-জানা, না-বুঝা অশেষ কথামালার অনুরেখা। পটে-আঁকা ছবির পেছনে লুকিয়ে-থাকা গল্প কিংবা ইতিহাস-অতীতকে ভুলতে চাননি তিনি। অতীতের মাড়িয়ে-আসা পথের সব সত্যকে কবি ধারণ করতে চেয়েছেন ছবির আড়ালের গল্প-কাঠামোয়। এই ভাবনার ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের -যারা জীবনকে ঠিকভাবে উপভোগ করতেও শিখিনি, চেতনার অচেনা এক ভুবনে আঘাত করেছেন। ফেলে-আসা দিনের সব স্মৃতি, সব কথা যে ফেলবার নয় -এ সত্য আমাদেরকে অনুধাবন করতে শিখিয়েছেন কবি। আপন আপন কিংবা পরিচিত ভুবনের ছবি যে কালের ও সমাজের ইতিহাস কিংবা সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে, তার পাঠও আমরা নিতে পারি তাঁর এই অভিনিবেশ থেকে।

মানুষের আপাত শক্তি, ধন-ঐশ্বর্য, খ্যাতি ও ক্ষমতা যে প্রকৃতপক্ষে মেকি ও মিথ্যা তার খবর আমরা ক’জন রাখি? লোভ আর লাভের মোহে আটকা পড়ে আমাদের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম হয়েছে প্রায়। “শা-জাহান” নামক কবিতায় তিনি ঐশ্বর্যের অটল পাহাড় ধসে পড়বার সকল সম্ভাবনাকে সামনের কাতারে সাজিয়ে তুলেছেন। সময়ের স্রোতে যে জীবন, যৌবন, ধন ও মান - সব কিছু ভেসে যায় তারই এক সত্য বিবরণ আমরা পেয়ে যাই তাঁর বর্ণনার সরলতার ভেতর দিয়ে। সময়ের এই অমিত গতির প্রবাহে অন্যের দিকে, অন্যের আচরণের অযথা বিশ্লেষণের দিকে তাকানোর সময় আমাদের কোথায়? অন্যের সমালোচনা না করে, অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় না নেমে আত্মসমালোচনা এবং নিজের সাথে নিজের প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে হবে; প্রতিনিয়ত অতিক্রম করতে হবে নিজকেই। পৃথিবীর ঘাটে-ঘাটে বা হাটে-হাটে দেনা-পাওনার হিসেবকে জটিল না করে যথাসম্ভব সরল করতে হবে। ব্যক্তি এবং কর্মকে বিবেচনা করে তাঁর ও তাঁর অবদানের স্থান নির্ধারণ করার দায়িত্বও আমাদের ওপরই বর্তায়। এই সহজ সত্যটিকে আমরা বুঝতে পারি না। কিংবা হয়তো না বুঝবার ভান করে থাকি। কবি রবি লিখছেন:

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,

তাই তব জীবনের রথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার

বারম্বার। (শা-জাহান)

নদীর নিজস্ব গতি আছে, আপন সুর ও গান আছে। নিঃশব্দে (শব্দ অবশ্য একটা আছে) অবিরাম ধেয়ে চলাই নদীর ধর্ম। সম্ভবত নদীর জন্মই হয়েছে কেবল ধেয়ে চলার জন্য। নদীর ধেয়ে চলার মধ্যে আমরা অবিরত চলার শিক্ষা লাভ করতে পারি; পেছনে না তাকিয়ে, গ্রহণ বা সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ না দিয়ে, কেবল এগিয়ে যাওয়ার এই পাঠ মানব সন্তানের জন্য অতীব জরুরি। পূর্ণতা বা তৃপ্তি নয়, অপূর্ণতা বা অপ্রাপ্তি-অতৃপ্তিই পারে অশেষ আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের পথ তৈরি করতে। নদীর উদারতা এবং নিঃশেষে দান করবার প্রবণতাও আমাদেরকে মানবিক বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ পাঠ নিতে সহায়তা করে। বিশেষত চলার গতি থেকে চঞ্চলতার উৎসাহতো আমরা পেয়েই থাকি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের সাথে পথ চলতে এবং নিজের প্রিয় বিষয়াদি অন্যের জন্য উদার মনে বিলিয়ে দেওয়ার সহজ পাঠ আমাদেরকে দিতে চেয়েছেন নদীর চলার গতিকে উদাহরণ হিশেবে সামনে দাঁড় করিয়ে।

বলাকা কাব্যের সবচেয়ে চমকপ্রদ কবিতা “বলাকা”। নদীর স্রোতের ধার বা তীক্ষ্ণতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিতার শুরুতেই কবি লিখেছেন:

“সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা

আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা

বাঁকা তলোয়ার!”

-সৃষ্টিজগতের অপার রহস্য এবং জীবকুলের ভাবপ্রকাশের আকুলতাকে কবি ধরতে চেয়েছেন কবিতার রহস্যঘেরা অন্য এক ফ্রেমে। তিনি জানেন মানুষ তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে চায়; নিজেকে মেলে ধরতে চায় অন্যের কাছে। কবির মনে হয়েছে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও যেন কথা বলতে আগ্রহী; হয়তো এরকম স্বপ্নও দেখে তারা; কিন্তু অসহায় সব জীব প্রকাশ করতে পারে না কোনো অভিব্যক্তি। ভেতরে ভেতরে গুমড়ে কেঁদে মরা ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো পথ খোলা থাকে না। জানাচ্ছেন সে কথা কবি:

“মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,

বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,

অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।” (বলাকা)

কবি মনে করেছেন, বলাকার শঙ্খ সৃষ্টিকর্তার আহ্বান বলয়। এই শঙ্খে অকল্যাণ-পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানসিক সংগ্রামের শক্তিও নিহিত রয়েছে। শক্তি ও প্রেরণার এই বলয়কে হেলায় মাটিতে ফেলে রাখতে নেই। দুঃখকে স্বীকার ও বহন করার জন্যও এই শক্তি কাজে লাগে বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। “শা-জাহান” (কবিতাটিকে প্রথমে “তাজমহল” নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল) কবিতা সম্বন্ধে কবি অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন: “পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলই সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে-সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয় - তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেইরকম। সে-সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো খসে পড়েছে, তাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয়নি।

সেই শাজাহানও নেই সেই মমতাজও নেই, কেবল তাদের যাত্রাপথের এক অংশের ধূলির উপরে জীবনের ক্রন্দনধ্বনি বহন করে রয়ে গেছে তাজমহল। ... সে-প্রেম দুঃখবন্ধুর পথে অন্তহীন সম্মুখের দিকে চলে গিয়েছে, সম্ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি নয়।"

ইহুদি পুরাণে আছে - মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে-লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। আর উপনিষদ বলছে: "সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্"; প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে - জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে - অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। এ কথা ঠিক যে, যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা কিনারে বা তীরে যেতে পারে না। তাই মানুষের প্রার্থনা ও সাধনা হওয়া উচিত পথ না এড়িয়ে অসত্য-অন্ধকার পথ পেরিয়ে আলোর জগতে প্রবেশ করা। বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর সাহিত্যসাধনার পরিণতপর্বে এই সাধনাকেই আশ্রয় করেছেন মনে-প্রাণে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বলাকা পর্বের কবিতা রচনা করেন কবি। বিশেষ করে সবুজপত্র মাসিক পত্রিকার তাগিদে তাঁকে তখন এই কবিতাগুলো লিখতে হয়েছিল। সে-সময়ে সারাপৃথিবীজুড়ে চলছে ভাঙাচোরার খেলা, বইছে পরিবর্তনের প্রবল হাওয়া। রুশ বিপ্লবও আসন্ন। জড়তা থেকে তারুণ্যের জয়ের পথে পৃথিবীর সকল গতিপথ ধাবমান। এই ভাঙাচোরার মধ্যে কবির মানসিক অস্থিরতার অনর্গল (ধারাবাহিক) বহির্প্রকাশ বলাকার কবিতা। সবকটি কবিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ একটা যোগসূত্র রয়েছে বলেও কবির ধারণা। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, হংসশ্রেণীর মতনই মানুষ যেন মানসলোক থেকে যাত্রা শুরু করে অপ্রকাশ কোনো বেদনা ও ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় কোন সুদূরে উড়ে চলে যাচ্ছে। যুদ্ধ চলাকালে কবি ইতিবাচক পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছিলেন। যুদ্ধের অনুভূতি নয়; তাঁর ভেতরে কাজ করছিল অতীত রাত্রিসম অন্ধকার পেরিয়ে আলোর পথে নতুনযুগে পদার্পণের আনন্দ। আর তাই হয়তো তিনি কষ্টের অবসান ও আনন্দের সূর্যোদয়ের সম্ভাবনার কথাই আঁকতে চেয়েছেন বলাকার ধেয়ে চলার আনন্দের মধ্য দিয়ে।

"বলাকা" কবিতায় আত্ম-উদ্বোধনের আহ্বান আছে। কবি মনে করেন মানসিক উৎফুল্লতা, চঞ্চলতা আর সামনে এগিয়ে চলার প্রবণতা মানুষকে সত্যিকারের বাঁচবার পথ দেখাতে পারে। কবি জানেন, জীবনের গতির অন্বেষার মধ্য দিয়ে নতুন সভ্যতা নির্মাণের আভাস প্রতিফলিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক অভিপ্রায়কে বুকে ধারণ করে কবিতায় তার প্রাণসঞ্চার করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ানোর সময় শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে "বলাকা" সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের অনুলেখন থেকে, তার সারকথা এরকম:

"বলাকা বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার (৩৬ সংখ্যক কবিতা: বলাকা) মর্মগত ভাবটা নিহীত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না, কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং বলাকা বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। বলাকা নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তাদের ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে - এমন সময় তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন সিন্ধুতীরে আর-এর বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

সেদিন সন্ধ্যার আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল - এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ সকলে এক জায়গায় চলেছে; তাদের কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ তা জানি নে। আকাশের তারার প্রবাহের মতো, সৌর-জগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো এই বিশ্ব কোন নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছোটাছুটি তা জানি নে,

কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী - এখানে নয়, এখানে নয়।”

দিনের শুরুতে সূর্য উদয়ের ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যচর্চার প্রথমপাদে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ” কবিতায় তাঁর সে ভাবনার কথা লেখা আছে। আর শিল্পচর্চার পরিণত পর্যায়ে পদার্পণ করে কবি পাখির চঞ্চলতার ভেতরে আবিষ্কার করেছেন মানবজীবনের না-বলা কিছু কথার বিস্ময়কর অনুভব। অজানার যতোসব রাজ্যে ভরা এই পৃথিবীর সন্তান রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবাকভরা মনের আকুতি প্রকাশ করেছেন এভাবে:

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে

সন্ধ্যার গগনে

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে

মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

হে হংসবলাকা,

ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে

বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে। (বলাকা)

পাখির এই চলাচলের নিয়মাদি যেন জীবনের সকল স্তব্ধতার গায়ে প্রবল এক আঘাত হিশেবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্তত কবি সে রকমই ভাবছেন। তিনি মনে করছেন যারা ঘুমিয়ে আছে শান্তিতে; কেবল পৃথিবীর সুবিধাসকল ভোগ করবার জন্য সময় পার করছে, তাদের জন্য এ এক মহাবাণী। ভোগ আর উপভোগের সীমানার বাইরে যে সুন্দর জীবন, দুনিয়ার যে অসীম রহস্য ও স্বপ্নঘেরা মমতা, তার সৌন্দর্য দেখে নেওয়ার আহ্বান আছে জেগে ওঠার এই প্রত্যয়ের মধ্যে। এই জাগবার; গভীর গভীরতর তন্দ্রা থেকে আড়মোরা ভেঙে জেগে উঠবার আহ্বান বারতাকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন সহজ-সরল বিবৃতিভাষ্যে:

মনে হল এ পাখার বাণী

দিল আনি

শুধু পলকের তরে

পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে

বেগের আবেগ।” (ওই)

কবির মনে হয়েছে এই বসুন্ধরার তাবৎ জড়বস্তুও বুঝি গতির দানে যোগ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। গতিভাবনায় লীন এই কবিতা-কারিগর অন্তর্দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন - পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষাদি, মেঘমালার অসীম অন্বেষার পথে নিজেকে মেলে ধরার আকুলতা; অজানাকে জানবার, নিজেকে জানাবার জন্য এই যে অস্থিরতা, তাকে কবি ধরতে চেয়েছেন সবকিছু জয় করবার নেশার আবরণের ভেতর। তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন -

“বাজিল নিখিল বাণী নিখিলের প্রাণে-

হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্খানে।”

-সন্ধ্যার আলো-আঁধারির রহস্যময়তার ভেতরে অবগাহন করতে করতে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছেন অন্য এক রহস্যের মায়াজালে। আর আমাদেরকেও যেন আটকে ফেলেছেন এই জালের জটিল সুতোয়! চারিদিকে যেন কেবল কান্নার রোল; অসীম শূন্যতার সৌন্দকে ধরতে না-পারার বেদনায় বোধহয় বিষণ্ন এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। যেন কেবল নিজেকে মেলে ধরবার; সুদুরে ছুটে যাবার মহা-আয়োজনের শুভ সূচনা আমাদের দোরগোড়ায়। অজানার এই মহাসমুদ্রের অভিযাত্রী হিশেবে আমরাতো নতুন; অতীতের পাটাতনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ভবিষ্যতের অজানা বিশ্বকে জানবার জন্য দরকার সীমাহীন উদ্যম আর চিন্তার চঞ্চলতা। জগতের সকল সৃষ্টির যাপিত জীবন আর চলাচলের মধ্যে সেই অমিত বাণীই কেবল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। “বলাকা” কবিতাটির শেষাংশে ঠাকুর লিখেছেন:

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে

অলক্ষিত পথে উড়ে চলে

অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

শুনিলাম আপন অন্তরে

অসংখ্য পাখির সাথে

দিনেরাতে

এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে

কোন্ পার হতে কোন্ পারে।

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্যে নিখিলের পাখার এ গানে-

“হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।”

আমরা বোধহয় স্বীকার করবো যে, মানবজীবনের জন্য ক্রম-উন্নতির পাঠ অত্যন্ত জরুরি এক বিষয়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে আমরা প্রায় সকলে এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাগ্রহণের পথ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করি - সজ্ঞানে অথবা অবচেতনে। রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর শিল্পের বাতাসে আমাদের এই ঘুমিয়েথাকা চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন। “বলাকা” কবিতায়ও রয়েছে সে রকমই সহজ ও দরকারি আহ্বানের উজ্জ্বল ইশারা। কবি বোধকরি তাঁর পাঠককে জানাতে চেয়েছেন - থেমে থাকবার জন্য আমাদের হাতে কোনো সময় নেই; কাজের মধ্যে দিয়ে, চলমানতার মধ্য দিয়ে পার করতে হবে জীবনের জন্য বরাদ্দকৃত সামান্যতম পথ। হতাশা আর কষ্ট মনের ভেতরে লুকিয়ে না রেখে আনন্দের মধ্যে দিয়ে যাপন করতে হবে সুখকর জীবন।